নতুন চিন্তা

ঘটনা-অঘটনের আইসিটি

আবীর হাসান

প্রযুক্তির শক্তি যে সবসময় সবার জন্য স্বস্তিকর হয় না, তার প্রমাণ এই খোদ আইসিটি। সেই মাইকেল অ্যাসাঞ্জ থেকে যদি আমরা ঘটনা-অঘটনের হিসাব করতে বসি, তাহলে দেখতে পাব এই বিশ্বের বর্তমান শক্তিধররা বেশ বড় ধাক্কাই খেয়েছিলেন নৈতিক এবং বৈষয়িক উভয় দিক থেকেই। তারপর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে দেখা গেল জনগণের শক্তির আধার হয়ে উঠছে আইসিটি। সবার কাছে যে বিষয়টি স্বস্তিকর ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর স্বৈরশাসকদের কাছে। এতদিন এরকম একটা ধারণা নিয়ে বেশ স্বস্তিতেই ছিলেন পশ্চিমা দেশগুলোর শাসকরা। তারা অবশ্য-অবশ্যই দাবি করেন তারা স্বৈরশাসক নন– তারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ চালান। কিন্তু আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আধুনিক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডন নগরীতে যা ঘটল তাতে কি অনেকটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেল না এতদিনকার অনুসৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি! কারণ এ পদ্ধতি মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে পারেনি, পারেনি আদর্শকে ধরে রাখতে। দাঙ্গা-লুটপাটের যে চিত্র স্যাটেলাইট টেলিভিশনের কল্যাণে বিশ্ববাসী দিন পাঁচেক ধরে দেখেছে তাতে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, মানুষের হাতে আসা শক্তিকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে না দিলে তা ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে বাধ্য। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যা হয়েছে, একদিক থেকে লন্ডনে যা ঘটেছে তা একই। এখন পশ্চিমা বিশ্বের নেতারা বলতে চাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ তিউনিসিয়া, মিসর, ইয়েমেন, সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আর লন্ডনে যা ঘটেছে তা টিন-এজারদের 'নিছক ছেলেমি'। আর দোষ চাপানো হচ্ছে আইসিটির ওপর। আইসিটির নতুন ও সস্তা সুবিধাগুলো কাজে লাগিয়েই নাকি কেবল মজা করতে গিয়ে স্কুল-কলেজে পড়ুয়া বালক-বালিকারা দাঙ্গা বাধিয়ে ফেলেছে, তাই এখন আইসিটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য আদেশ জারি হয়েছে। বলা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর অপব্যবহার চলবে না। মন্ত্রীরা দফায় দফায় বৈঠক করেছেন বিভিন্ন আইসিটি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে। এও বলা হয়েছে– ব্ল্যাকবেরির সস্তা সার্ভিসের জন্য নাকি স্কুল পড়ুয়ারা এর যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। কাজেই 'নিয়ন্ত্রণ' করার উপায় খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে এখন। তবে স্ববিরোধিতা যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকট এতে তাই প্রমাণিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ছেলেমেয়েরা যখন তাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিল সামাজিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, তখন তাকে বলা হলো মহৎ কর্ম আর যখন লন্ডনের ছেলেমেয়েরা পুলিশের একটি অনৈতিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হলো, তখন তাকে বলা হলো অবৈধ ব্যাপার। লুটপাটের ব্যাপার তো ঘটেছে পরে– সুযোগসন্ধানী, বেকার আর নিয়ম ভাঙতে চাওয়ার প্রবণতা যাদের মধ্যে আছে তারা প্রতিবাদটাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে অপরাধের মাধ্যমে। অপরাধ সম্পর্কে ব্রিটেনের মতো আধুনিক দেশে যে মূল্যবোধ কত ঠুনকো তার অনেকটাই যেন বেরিয়ে এসেছে এবার। আরও অনেক কিছুই গোপন রয়ে গেছে– চেষ্টা চলছে গোপন করে রাখারও। ১৬ বছর বয়সী এক কিশোর টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে অকপটে স্বীকার করেছে তার শিশুকন্যার জন্য 'খাবার' লুট করতে বেরিয়েছিল সে। অন্য দেশের বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম ইত্যাদি নিয়ে যারা খবরদারি করে তাদের দেশের সমাজের এ কী চিত্র! এর জন্যও কী আইসিটি দায়ী? বলা যায় না কোনদিন রক্ষণশীল ব্রিটিশ সরকার বলে বসবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত খবরাখবর ওয়েবসাইট থেকে দেখে তাদের দেশের বালক-বালিকারা বখে যাচ্ছে। অতএব নিয়ন্ত্রণ করো আর নিয়ন্ত্রণের এক অমোঘ উপায় তো জানে টোরিরা– ট্যাক্স বসানো। বলা যায় না আইসিটির বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে উচ্চ হারে ট্যাক্স বসাতেও পারে বর্তমান ব্রিটিশ সরকার!

তবে পশ্চিমের অঘটনের শেষ এখানেই নয়, আরও আছে। আরও পশ্চিমের দেশে– আটলান্টিকের ওপারে মার্কিন মুলুকে নীরবে এক অঘটনা ঘটে চলেছে। মার্কিন ডাক বিভাগ এখন মৃত প্রায়, ধুঁকছেই বলা চলে। লোকজন বলতে গেলে চিঠিপত্র লেখা ছেড়েই দিয়েছে– না লেখা ছাড়েনি, ডাক পাঠানো পরিত্যাগ করেছে, ফলে ডাকঘরগুলো অলস পড়ে আছে। আর এতে মন্দা সামলাতে হিমশিম খাওয়া ওবামা প্রশাসনের মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। ডাক বিভাগে চালানো হয়েছে ব্যাপক ছাঁটাই– পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করা হয়নি তথাকথিত সমাজকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ থেকে! এক্ষেত্রেও দোষ দেয়া হয়েছে আইসিটির। বলা হয়েছে, মানুষ অতিমাত্রায় ই-মেইল এবং সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলো ব্যবহার করায় ডাক ব্যবস্থা উপযোগিতা হারাতে বসেছে। এখন যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা হলো– কয়েকটি মাত্র ডাকঘর রেখে বাকি অধিকাংশই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আইসিটির সার্ভিসগুলোর ওপর ট্যাক্স বা ভ্যাট বসানোর সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি, তবে মার্কিন প্রশাসন সম্ভাবনা যাচাই করছে এ খাত থেকে সরকারি আয় বৃদ্ধি কেমন করে হতে পারে। পাশ্চাত্যের এ ঘটনাগুলো এখন আমাদের পর্যালোচনা করতে হচ্ছে দুটো কারণে– প্রথমত: আইসিটি সত্যিই এবার সংস্কৃতির বদল ঘটাতে শুরু করেছে আর দ্বিতীয়ত: সরকারের দিক থেকে আইসিটির ওপর চাপ আসার আশঙ্কার জন্য।

প্রথম বিষয়টিকে যদি আমরা বিবেচনায় আনি তাহলে দেখতে পাব– আইসিটি প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছে বেশ শক্তিমত্তা দিয়েই। যে প্রথাগুলো এতদিন প্রচলিত ছিল সেসবের বিরুদ্ধে কথা বলা যেত না কিংবা মনে এলেও প্রথার কারণে বলা নিষেধ ছিল– সেগুলো মানুষ বলতে শুরু করেছে সামাজিক ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে। এর ফলে অন্তত শ'দুয়েক বছর ধরে যেসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অধীনে সমাজ চলত সেগুলো প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। একথা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ব্যাপারে যেমন সত্য, পশ্চিমা দেশগুলোর ব্যাপারেও তেমনি সত্য।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ৩০-৪০ বছর ধরে চলতে থাকা একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করছে সেসব দেশের নতুন প্রজন্ম। নৈতিকতার দিক থেকে দোষের ভার ওসব দেশের তরুণদের কিছুটা কম– তবে তা পাশ্চাত্য মূল্যবোধে। মধ্যপ্রাচ্য বা আরব মূল্যবোধে শাসককে তার জীবনকালে মেনে চলাই ইতিকর্তব্য হিসেবে দেখতে বলা হয়েছে। কিন্তু এ প্রজন্ম পাশ্চাত্যের মূল্যবোধগুলো অথবা সর্বজনীন গণতান্ত্রিক চলমান মূল্যবোধগুলোর কথা জানতে পারছে। ফলে তারা প্রতিবাদী হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবাদী হওয়াটাই তাদের জন্য মুখ্য পরিবর্তন নয়। তারা আসলে চাচ্ছে একটা নতুন সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি সবরকম বাধ্যবাধকতা থেকে তাদের মুক্তি দেবে। এই সংস্কৃতিটাই তাদের আগে ছিল না, ধর্ম কিছুটা আর বেশিরভাগই আরব সামাজিক সংস্কৃতি তাদেরকে এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে বাধ্য করেছে এতদিন– এখনও করছে। নারী স্বাধীনতা, শিশু অধিকার– এসব কথা বলা এখনও বেশিরভাগ আরব দেশে নিষিদ্ধ। এটাই তাদের সংস্কৃতি, কিন্তু এখন এই সংস্কৃতির পরিবর্তন আসন্ন। এজন্য এই আশাবাদ ব্যক্ত করা যাচ্ছে যে, তাদের হাতে এখন রয়েছে বেশ শক্তিশালী একটি হাতিয়ার– আইসিটি। এর মধ্যে নিজের 'দুঃখের কাহিনী' যেমন জানানো যাচ্ছে, তেমনি প্রতিবাদ করতে সংগঠিত হওয়ার জন্যও ডাক দেয়া যাচ্ছে রাস্তায় না নেমেই। যদিও শেষমেশ রাস্তায় নামতেই হচ্ছে, তবে অসংগঠিত অবস্থায় নয়– একাকীও নয়। ►

পাশ্চাত্যে ঘটনাটা একটু অন্যরকম হলেও শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক রক্ষণশীলতা অপ্রকট নয় সেখানেও। পোশাকের ঝোলামেলা সিনেমায় যতটা প্রকট ততটা প্রকট নয় সামাজিকতায়। গণতন্ত্রিকতার নিয়মের অনেক প্রথা বিস্ময়করভাবে মধ্যযুগীয়। ব্রিটেনের এখনকার সমস্যাটা আসলে দুটি প্রজন্মের দুই ধারার চিন্তার সংঘাত। আসলে পূর্ববর্তী প্রজন্ম ভুল করেছে রক্ষণশীল দলকে ভোট দিয়ে, যা মানতে রাজি নয় নতুন প্রজন্ম। ব্রিটেনের বিগত নির্বাচনের ফল দেখে মনে হয়েছে ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গ প্রাপ্তবয়স্করা একটি 'গণতান্ত্রিক ভুলই' করে ফেলেছে। তারা প্রায়শ্চিত্ত করার পথ পাচ্ছে না এখন। আর নতুন প্রজন্ম যারা তাদের অভিভাবকদের কাছে হেরে গেছে, তারা তাদের প্রতিবাদ জানানোর জন্য বেছে নিয়েছে বিকল্প পন্থা অথবা বলা যায় এ যুগের পন্থা– আইসিটি। এটা তাদের প্রচলিত সংস্কৃতিকে সুস্পষ্টভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং সামাজিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে আরও আগে থেকেই। একবিংশ শতাব্দী শুরুর প্রথম লগ্ন থেকেই মার্কিন নাগরিকদের 'গেটস্ প্রজন্ম' চিন্তাধারাকেই পাল্টে ফেলার আন্দোলন শুরু করেছে এবং এর ফলে উদ্ভব ঘটেছে সামাজিক ওয়েবসাইটগুলোর। বিভিন্ন ব্লগ সাইটও বিকল্প একটা সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। আগের চার্চনির্ভর সমাজের বিপক্ষে অনেকটাই ব্যক্তিস্বাধীনতার শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে আইসিটিনির্ভর নতুন প্রজন্ম। এ কারণেই বেড়েছে তাদের প্রতিপত্তি আর সামাজিক আধিপত্য। যদিও প্রশাসনিক প্রভাবকে এখন পর্যন্ত তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি, তবুও তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এজন্যই নির্বাচনী প্রচার শুরুর প্রথমেই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে যেতে হয়েছে আইসিটি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যখন এসব প্রতিষ্ঠানের শক্তিমত্তা প্রমাণিত হয়েছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে কিছু হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। আসলে সব সংস্কৃতিই বলছে– ডাকঘর যে থাকছে না, এটাও তো একটা বিরাট ব্যাপার, সামাজিক ধৈর্যহীনতাও একটা সংস্কৃতি। কেউ আর অপেক্ষার প্রহর গুনতে রাজি নয়– চিন্তার গতিতে চলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই।

কিন্তু এই সবার মধ্যে কি সরকারগুলো আছে? দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না। গত বছর বিশেক ধরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউরোপ ও আমেরিকার সরকারগুলো কোনো নতুন যোগাযোগপ্রযুক্তির উদ্ভব ও সামাজিকীকরণ শুরু হলে বাঁকা চোখে দেখে। চোখ বাঁকাই শুধু করে না, কোনো কোনো সময় সেগুলোকে বাধা দেয়ার চেষ্টা পর্যন্ত চালায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সরকারি শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সবাই আইসিটিবান্ধব নন। কদিন আগে আমরা দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরশাসকদের কাছ, সিরিয়ায় তো এখনও চলছে। গণবিদ্রোহ ঠেকাতে প্রথম যে কাজটি এরা করেছে, তা হচ্ছে আইসিটিভিত্তিক সার্ভিস বন্ধ করা। এদিক দিয়ে দেখলে ব্রিটিশ সরকারও খুব একটা ব্যতিক্রম নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উন্নত দেশগুলোর সরকারও যদি আইসিটিকে অঘটনের জন্মদাতা মনে করে তাহলে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সরকার কী করবে? মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ তো বটেই– চীন, মালয়েশিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার– এসব দেশেও আইসিটির ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আসলে এটাও একটা সংস্কৃতি কিংবা শুদ্ধভাবে বলা যায় রাজনৈতিক সংস্কার! এটাই এখন আইসিটির সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভবত বিশ্বব্যাপী শাসকদের এই রূপটা বেরিয়ে এসেছে বছর দেড়েকের মধ্যে। আইসিটি ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে, গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করছে সহজ ও সুলভ বৈশিষ্ট্য। এই সময়ে প্রাচীন প্রথায় এর ব্যবহার ও বিস্তারে বাধা দিলে সমস্যা বাড়বেই। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না প্রচলিত গণতন্ত্রিক পদ্ধতিতে কোথাও একটা গলদ আছে, যা আইসিটিকে সহ্য করতে পারে না। এই গলদটাকে উৎপাটনের জন্যই আসলে এখন নতুন করে চিন্তা করতে হবে। ঘটনা-অঘটনের মধ্য দিয়ে গণমানুষের সামাজিক সংস্কৃতি যখন বলছে, তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতিরা বলবে না কেন?

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com